আদিবাসী লোক উৎসব

বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন বনাম আদিবাসী মুক্তির সংগ্রাম

ভূবনমোহন পার্ক, রাজশাহী
জাতীয় আদিবাসী পরিষদ

এ কে এম মাসুদ আলী

ইনসিডিন বাংলাদেশ
৯/১১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
২৯ চৈত্র, ১৪১৩ (২১ এপ্রিল, ২০০৭)

বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন বনাম আদিবাসী মুক্তির সংগ্রাম

আদিবাসী মুক্তির সংগ্রাম সময়ের সাথে সাথে অগ্রসর হচ্ছে– এই অগ্রসরমানতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিজয়ের মাত্রায় নয়, বিচার করতে হবে মুক্তিচিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিরীখেও। আদিবাসী মানুষের সংগ্রামশীলতা প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষনের মাত্রা অতিক্রম করে বর্তমানে মানবিক মুক্তির লড়াইয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মুক্তিচিন্তার ক্ষেত্রে আজ কেবল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্য নয়, যুক্ত হয়েছে সমতা ও সংহতির রাজনৈতিক মাত্রা। এই লড়াইয়ের পরিসর বিচ্ছিন্ন লোকালয়ের সীমানা অতিক্রম করে বর্তমানে জাতীয়, আঞ্চলিক তথা বৈশ্বিক মাত্রাও অর্জন করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনার শিরোনাম "বিশ্বায়ন বনাম মুক্তির স্বপ্ন" বদলে আমরা কেন "বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন বনাম আদিবাসী মুক্তির সংগ্রাম" রাখলাম তা' ব্যাখ্যা করা জর"রী।

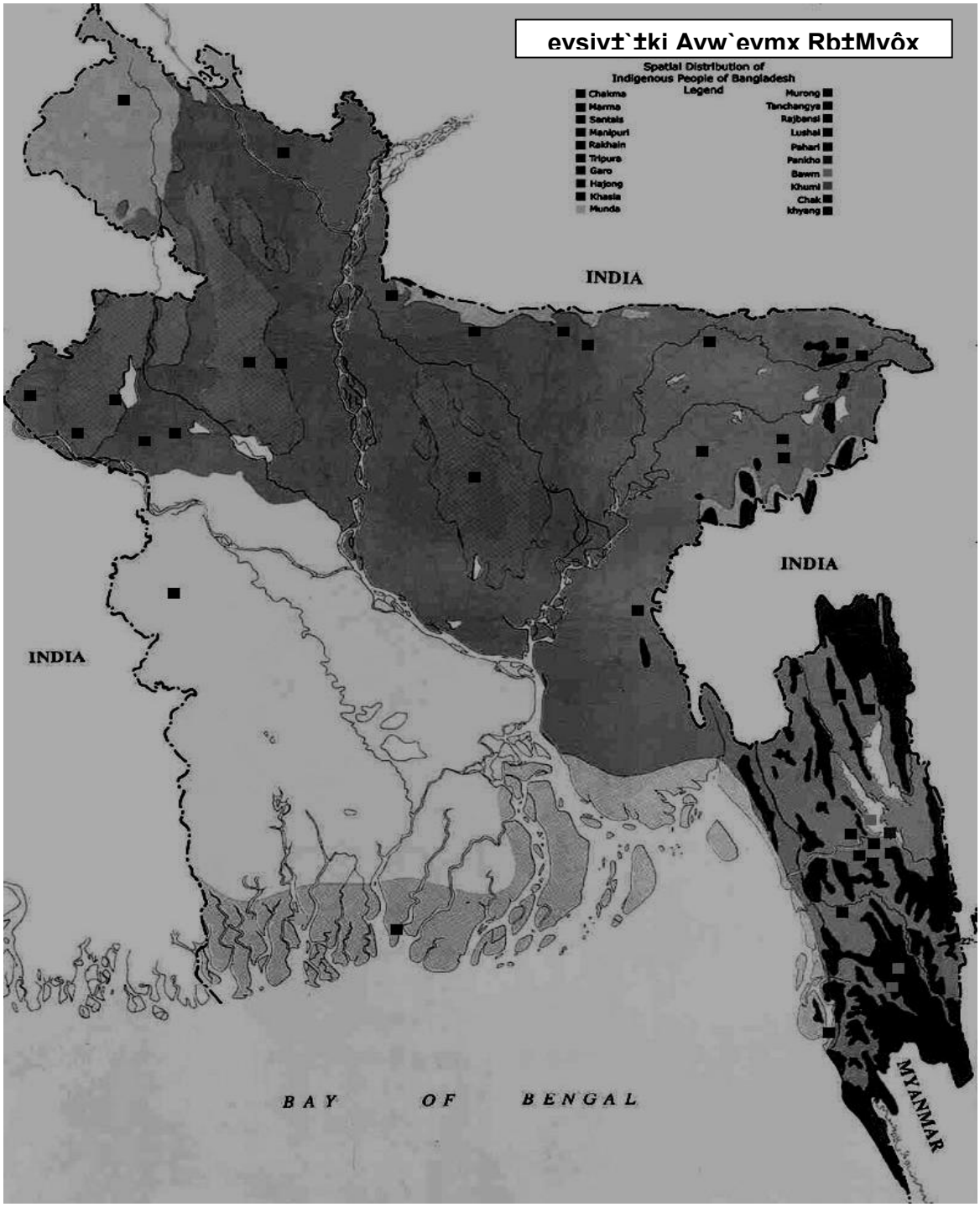
evsiv‡`‡ki Avw`evmx Rb‡Mvôx
Spatial Distribution of
Indigenous People of Bangladesh
Legend
Chakma
Marma
Santals
Manipuri
Rakhain
Tripura
Garo
Hajong
Khasia
Munda
Murong
Tanchangya
Rajbansi
Lushai
Pahari
Panicho
Bawm
Khumi
Chak
Khyang
INDIA
INDIA
INDIA
BAY OF BENGAL
MYANMAR

১. বিশ্বায়ন: বাণিজ্যিক বনাম মানবিক

বিশ্বায়ন নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে নানা রকম ধারণা। এর মধ্যে প্রধান একটি ধারণা হলো বিশ্বায়নের মাধ্যমে পুরো পৃথিবী এক বৃহত্তর সংহতি অর্জন করবে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এক 'বৈশ্বিক গ্রাম'। আরেকটি প্রচলিত মত হচ্ছে বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিশ্বের ধনী দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে এবং গরীব দেশগুলোর মানুষের ধনী দেশগুলোতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচলিত বাধাগুলো অপসারিত হবে। যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতি বিশ্বের দেশগুলোকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার মাধ্যমে দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনবে এবং এভাবেই সম্পন্ন হবে মানুষের কাঙ্ক্ষিত বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়নের এই আশাবাদী এবং মানবিক চিত্রের বিপরীতে বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রধান ধারাটি হলো বাণিজ্য কেন্দ্রিক। বাণিজ্য উদারীকরণ ও ধনী দেশগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণেই এই বিশ্বায়নের অঙ্গীকার নিবদ্ধ। বিশ্বায়ন কথাটি সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এবং বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোর সৌজন্যে। ধনীদেশের নগ্ন হস্তক্ষেপে চলমান বিশ্ববাণিজ্য উদারীকরণ প্রক্রিয়াকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বায়ন বলতে "ওনারা" বোঝান বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নেতৃত্বাধীন বাণিজ্য উদারীকরণ প্রক্রিয়া। বাণিজ্য উদারীকরণের এই প্রক্রিয়া ধনীদেশগুলোর স্বার্থের অনুকূলে বাণিজ্য আবহ তৈরি করছে আর দরিদ্র দেশগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্যে কোনঠাসা করে ফেলছে। অথচ পশ্চিমারা প্রচার করছেন, বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন সবাইকে নিয়ে এসেছে সমতা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতার অঙ্গনে।

এই বৈষম্যভিত্তিক বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের অনুষঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাদ, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংঘাত ও বিভক্তি। চলমান এই অমানবিক ধারার বিপরীতে এ কারণেই ধনী-দরিদ্র দেশ নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী মানবিক বিশ্বায়নের সংগঠকরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে। প্রতিরোধ সংঘবদ্ধতার ধারাবাহিকতায় 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের" মতো আন্তর্জাতিক গণসংহতি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সংহতির প্রকাশ ঘটছে একদেশের জনগনের ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামের পক্ষে, অপরাপর দেশসমূহের মানবাধিকার কর্মী, শ্রমিক সংগঠন, নারী সংগঠন বা পরিবেশবাদীদের সংহতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

বিশ্বায়নের এই পর্যায়ে একারণে "বিশ্বায়ন" শব্দটিকে "মানবিক" বা "বাণিজ্যিক" বিশেষণে বিশেষায়িত না করলে মুক্তির প্রসঙ্গটি - *স্বপ্ন ও সংগ্রামের* প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনা। বিশ্বায়ন একটি বাস্তবতা যা অতীতেও বিদ্যমান ছিল এবং আগামী দিনগুলোতেও একইভাবে বলবৎ থাকবে। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই মুক্তির স্বপ্ন ও সংগ্রাম দুইই অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে এখন হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক। মানবিক বিশ্বায়নের অঙ্গনই নিপীড়িত জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ তথা মানবতার সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র। মুক্তির স্বপ্ন ও সংগ্রাম জাতীয় পরিসরে উন্মেষিত হলেও অতি দ্রুত তার আন্তর্জাতিকতা প্রাপ্তি ঘটে। সমস্যার বিশেণ্ডষনে দেখা যায়, বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের শক্তি জাতীয় পরিসরেও নিপীড়নের অনুষঙ্গী থাকে। এ কারণে জাতীয় পর্যায়ের মুক্তির লড়াই বিশ্বমানবতার মুক্তির অনুষঙ্গী।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচনার শিরোনাম "বিশ্বায়ন" হলেও আমরা শুরু করবো জাতীয় পরিসর বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে। আমরা দেখবো যে, জাতীয় পর্যায়ের সঙ্কটের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের পরাশক্তিসমূহ।

২. বাংলাদেশ ও আদিবাসী অধিকার : অঙ্গীকার ও বাস্তবতা

বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী। সর্বোপরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান মানবাধিকার সংরক্ষনের ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট দলিল। তবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশেণ্ডষন করলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি প্রধান দিক হিসেবে সামনে চলে আসে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও বিশ্বায়নের পরিসরকে বিশেণ্ডষণ করবার আগে সংক্ষেপে আমরা আদিবাসী অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অঙ্গীকার ও বাস্তবতার একটি হিসেব তুলে ধরছি।

মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকারের স্মারক

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ধারা (১) সমস্ত মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছে। ধারা (২) এ গোত্র, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষে মালিকানার ক্ষেত্রে সমান অধিকার, আদিবাসীসহ সকল অধিবাসীদের বৈষম্যহীন নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হয়েছে। ধারা (১৫) জাতীয়তার অধিকার, ধারা (২০) সংগঠনের অধিকার, ধারা (২২) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করছে। ধারা (২৭) ও (২৯) যথাক্রমে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সংরক্ষণ ও ব্যাক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ করছে।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সংবিধানও বৈষম্যহীন মানবাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করছে। সংবিধান মতে: মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা (ধারা-১১), আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমঅধিকার (ধারা-২৭), সকল বর্ণ, গোত্র প্রভৃতি প্রতি বৈষম্যহীনতা (ধারা-২৮), সরকারী পদে বৈষম্যহীন সুযোগ (ধারা-২৯) এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে একই রকম অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে।

মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ যে সকল অঙ্গীকারের অংশীদার তা সংবিধানে যত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ যাবৎকাল ততখানি প্রাধান্য পায়নি। এর ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য পরিচয়, সংস্কৃতি, জীবিকা, আবাস তথা আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা হয়েছে প্রায় ক্ষেত্রেই পদদলিত। বৈষম্যের শিকার হয়েছেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় সকল সদস্যই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মালিকানা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নাগরিক অধিকার অঙ্গানেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ঠেলে দেয়া হয়েছে প্রান্তিক অবস্থানে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির উপর এঁটে দেয়া হয়েছে পশ্চাৎপদতার তক্মা। তবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার, কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভারের উপর সভ্যতা, উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে চালানো হয়েছে শতাব্দীব্যাপি নির্মম লুণ্ঠন। এই নিষ্পেষনে রাষ্ট্র কখনও নিজেই সক্রিয় হয়েছে আবার কখনও বা সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে যুগিয়েছে নিরব সমর্থন।

বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসী অধিকার সংরক্ষনের একাধিক উদ্যোগ থাকলেও আদিবাসী অধিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আজও অনুপস্থিত। আদিবাসী মুক্তি সংগ্রামে কাগুজে স্বীকৃতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হয়ে উঠতে পারে। সাংবিধানিক এই স্বীকৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অবস্থানকে একটি আইনী ভিত্তি যোগাতে পারে।

বিশ্বায়নের যুগে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মুক্তি সংগ্রামের একটি জাতীয় মাত্রা রয়েছে। বিশ্বায়নের বাণিজ্যিক ক্ষুধার কোপানলে আদিবাসী অধিকার দগ্ধের দিকটি আলোচনার আগে এ কারণে দৃষ্টি দেয়া যাক আদিবাসী সংগ্রামের জাতীয় প্রেক্ষিতের প্রতি। তবে সময়ের সংক্ষিপ্ততা এবং গুরুত্ব বিচারে আদিবাসী আবাসন, ঐতিহ্যগত, প্রাণ ও প্রাকৃতিক সম্ভার, কৃষি ও জীবনাচরণ যেভাবে অবদমিত হচ্ছে আমাদের আলোচনা সে প্রসঙ্গেই সীমিত থাকছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর-আদিবাসে পরবাস

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আবাস, কৃষিক্ষেত্র এবং জল ও বনভূমির উপর যে অলিখিত ঐতিহ্যগত সামাজিক মালিকানা বংশ পরাম্পরায় চলে আসছিল, তা বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে হয়েছে চরমভাবে উপেক্ষিত। আদিবাসীর ঐতিহ্যগত কৃষি অঞ্চল, বিভিন্ন প্রাণ সম্পদ আহরণের উৎস যে বনভূমি এবং সার্বজনীন প্রয়োজন মেটাবার যে জলসম্পদ তার উপর বহুপূর্বেই দুই ধরণের খড়্গ নেমে এসেছে। প্রথমত: ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধুনিক আইনকে কাজে লাগিয়ে বাঙ্গালী ক্ষমতাধরেরা দখল করে বসেছে আদিবাসী ভূসম্পদ। দ্বিতীয়ত: উন্নয়ন প্রকল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ, উন্মুক্ত জলাধারগুলোর উপর লিজ ভিত্তিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও বনাঞ্চলকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি, অপরদিকে বনসম্পদ রক্ষার নামে আরোপিত সংরক্ষণ নীতি আদিবাসী মানুষকে তাদের সমতল পাহাড় ও বনাঞ্চলের আদিভূম থেকে করেছে উচ্ছেদ।

এর পাশাপাশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পেশাগত জীবনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। তাদের চিরায়ত প্রাকৃতিক সম্পদ উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে, বাণিজ্যিক আগ্রাসনে নিজস্ব হস্তশিল্প মুখ থুবড়ে পড়ায় এবং আধুনিক জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাধ্য হচ্ছে গ্রামীণ শ্রমবাজারে দিনমজুর হিসেবে হাজিরা দিতে। কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক আদিবাসী মানুষের হাতে আছে জমির মালিকানা। তবে প্রতিনিয়তই ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর কাতারেই নেমে আসছে আদিবাসী মানুষেরা। এই ভূমিহীনতার স্বরূপ উন্মোচনে বিশেষ কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক:

- বাজার অর্থনীতির লাগামহীন বিস্তার আদিবাসী মানুষকে করে তুলেছে প্রান্তিক। এর কারণ আদিবাসী জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন বাজার অর্থনীতির বিষয়ে অনভিজ্ঞ অন্যদিকে তেমন বাজার অর্থনীতি আদিবাসী সামাজিক ও নৈতিক মানসে অগ্রহণযোগ্য একটি প্রকরণ
- ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে বাজার শক্তির বিস্তার, অর্থ ও রাষ্ট্র শক্তির সাথে সম্পর্কিত মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে ক্রমাগতভাবে ভূমিমালিকানাকে কেন্দ্রীভূত করছে
- আধুনিক কৃষির নামে বাজার নির্ভর রাসায়নিক ও যান্ত্রিক কৃষির বিস্তার এবং কৃষি উপকরণের ধারাবহিকভাবে মূল্যবৃদ্ধি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তিন মাত্রায় প্রান্তিক করে তুলেছে। প্রথমত: এই আধুনিক কৃষি ধবংস করছে ঐতিহ্যগত প্রকৃতিবান্ধব আদিবাসী কৃষি ব্যবস্থাপনা ও জ্ঞান। দ্বিতীয়ত: প্রকৃতি বিধবংসী কৃষির আওতায় আদিবাসী প্রাণ বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়ত: বাজার ভিত্তিক কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও কৃতকৌশলগত দক্ষতার অনুপস্থিতি আদিবাসী কৃষককে নিরন্তর ক্ষতির বোঝায় নিম্নমুখী করছে।

- আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মপরিচয় সামাজিক ও সামষ্টিক আদিবাসী পরিচয়কে দুর্বল করে তুলছে। এর ফলে আদিবাসী মানুষ হারাচ্ছে তার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে বাজার অর্থনীতি ও বাজার মূল্যবোধ আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিকে আক্রমন করছে তার রয়েছে একটি বৈশ্বিক মাত্রা। আজকে যে আধুনিক কৃষির আগ্রাসন আদিবাসী কৃষক ও জনগোষ্ঠীকে ভূমিচ্যুত করছে তা একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চক্রের অংশ। এক্ষেত্রে অবশ্য বাঙ্গালী ক্ষুদ্র কৃষকের সাথে আদিবাসী কৃষকের জাতীয় অঙ্গনে একটি ঐক্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কাজেই আদিবাসী মুক্তি সংগ্রামের জাতীয় প্রেক্ষিতে একদিকে যেমন আছে বাঙ্গালীর বড় জাতি সুলভ আচরণের সাথে সংঘাত তেমনি রয়েছে বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা। উলেণ্ঢখ্য যে, জাতীয় ক্ষেত্রে সংঘাতের উৎস যে বৈষম্য তার মীমাংসা করতে না পারলে জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে আদিবাসী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো একটি প্রহসন। আজকের আদীবাসি উৎসবে আদীবাসী-বাঙ্গালী সম্মিলন জাতীয় প্রেক্ষিতে আদীবাসির অধিকার সংরক্ষনের ঐক্যবদ্ধ সেই প্রয়াসের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাণিজ্যিক বিশ্বায়ণ নিয়ে পরবর্তী যে আলোচনা তাতে প্রবেশের আগে আসুন আমরা বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃত বৈষম্যহীনতার ঘোষণাকে বাস্তবতায় রূপ দেয়ার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হই। কেবলমাত্র এই উদ্যোগের মাঝেই আদিবাসী মুক্তি সংগ্রাম জাতীয় প্রেক্ষিতে শোষনমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে এককমাত্রা অর্জন করতে পারে।

বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের হাতিয়ার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রসঙ্গে এবার আলোকপাত করা যাক। এক্ষেত্রে আমরা গুরুত্বের সাথে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবকেই বিশেণ্ঢষণ করবো। তবে বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের অপর দুই সহচরকেও আমরা একই সাথে বিবেচনায় রাখবো। এর পাশাপাশি আমাদের দৃষ্টি থাকবে মূলত: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশিণ্ঢষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি, যার মধ্যে স্থান পাবে মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ চুক্তি, জীন বিকৃত প্রাণ প্রযুক্তি, কৃষি চুক্তি ও সেবাখাত উন্মুক্তকরণের বিষয়সমূহ।

৩. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা: বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের ক্রিড়নক

গ্যাটের উরুগুয়ে রাউন্ড (১৯৮৬-১৯৯৩) শেষে ডাঙ্কেল প্রস্ড়াব ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে সদস্যরাষ্ট্রগুলো কর্তৃক প্রত্যায়িত হলে ১৯৯৫ সালের প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডড়ৎষফ ঞৎধফব ঙৎমধহরূধঃরড়হ-ডঞঙ)। গ্যাটের সদস্যদেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের চুক্তির ফলে এ সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থা গঠনের ফলে গ্যাটের স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো বহাল থাকলেও মূল চুক্তির সঙ্গে কয়েকটি সিদ্ধান্ড় ও ঘোষণা সংযুক্ত করা হয়। বস্তুত গ্যাটের অধীনে স্বাক্ষরিত আন্ড়র্জাতিক চুক্তিগুলো তদারকি ও যথাযথভাবে বাস্ড়বায়িত করার লক্ষ্যেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয়।

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এ সংস্থার কাজ শুরু হয়েছে। ১৪৬টি দেশ বর্তমানে এ সংস্থার সদস্য। এর বাইরে বিভিন্ন শুল্ক এলাকা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সদস্যদেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন হলো সংস্থার চূড়ান্ড় কাঠামো। কমপক্ষে দুই বছরে একবার এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও আছে একটি সাধারণ পরিষদ। এই পরিষদই মূলত সংস্থার পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছে। সাধারণ পরিষদ সব সদস্যদেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব হলো, প্রয়োজনানুসারে অধিবেশন আহ্বান করা। নিয়মিতভাবে সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তির কার্যক্রম এবং মন্ত্রী পর্যায়ের সিদ্ধান্ড়সমূহ বাস্ড়বায়ন পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব এই পরিষদের ওপর ন্যস্ড়। সাধারণ পরিষদ গড়ে তুলবে কয়েকটি কাউন্সিল ও কমিটি। যেমন, গুডস কাউন্সিল, সার্ভিসেস কাউন্সিল, ট্রিপস কাউন্সিল ইত্যাদি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদর দপ্তর পরিচালিত হয় একজন ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে।

চুক্তি অনুয়ায়ী গ্যাটের ধারাবাহিকতায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের পাশাপাশি সেবা খাতের বাণিজ্য (ঞৎধফব রহ ঝবৎারপবং), বাণিজ্য সংশিণ্ঢষ্ট বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার (ঞৎধফব জবষধঃবফ অংঢ়বপঃং ড়ভ ওহঃবষষবপঃঁধষ চৎড়ঢ়ধঃু জরমযঃৎ), বিনিয়োগ ও কৃষিসহ মুক্তবাজার বিষয়ক সব বিষয়ে তদারক করবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ২৩টির বেশি চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা পরিচালনা করবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মূলত: একটি চুক্তিমালার সমাহার। চুক্তি সমূহের মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হলো-

১. কৃষিচুক্তি (অমৎববসবহঃ ড়হ অমৎরপঁষঃঁৎব)
২. টেক্সটাইল ও বস্ত্র চুক্তি (অমৎববসবহঃ ড়হ ঞবীঃরষব্ ঈষড়ঃযরহম)
৩. বাণিজ্য বিনিয়োগ চুক্তি (অমৎববসবহঃ ড়হ ঞৎধফব- জবষধঃবফ রহাবংঃসবহঃ গবধংঁৎবং- ঞজওগং)
৪. সেবা বাণিজ্যে সাধারণ চুক্তি (এবহবৎধষ অমৎববসবহঃ ড়হ ঞৎধফব রহ ংবৎারপবং)

৫. বাণিজ্য সংক্রান্ড় মেধাস্বত্ব চুক্তি (অমৎববসবহঃ ড়হ ঞৎধফব জবষধঃবফ অংঢ়বপঃং ড়ভ ওহঃবষবপঃঁধষ ঢ়ৎড়ঢ়বৎঃু জরমযঃং)

চুক্তি অনুযায়ী মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন, সাধারণ পরিষদ, বিভিন্ন কাউন্সিল ও কমিটি সবাই এক মত হয়ে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার চেষ্টা করবে। তবে, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ড় গৃহীত হবে। পূর্ববর্তী গ্যাট সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী ঐকমত্য হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। ফলে যেকোনো সদস্য প্রস্ড়াবে অসম্মতি জ্ঞাপন করামাত্র প্রস্ড়াব বাতিল করে দিতে হতো। কিন্তু নতুন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংগঠনটির কাঠামো সংশোধন করার ক্ষেত্রে, সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকা আবশ্যিক করা হয়েছে। ফলে কোনো সদস্যদেশের পক্ষেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মৌলিক কাঠামোর সংশোধন করিয়ে নেওয়া সহজ হবে না।

সংগঠনের কার্য পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হলে সদস্যদেশগুলোকে অন্য উপায় খুঁজে না পেলে সংগঠনের সদস্যপদ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সদস্যপদ ত্যাগ করার জন্য ছয় মাসের একটি নোটিশ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই নোটিশ দেওয়ার পর সদস্যদেশটি ছয় মাস অপেক্ষা করে সংগঠনের বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিভিন্ন সদস্যদেশের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রস্ড়াব পেশের ক্ষমতা ধারণ করে। অবশ্য আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য রোধের মীমাংসার জন্য উত্থাপিত কোনো প্রস্ড়াব কার্যকর করার লক্ষ্যে কোনো শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার এই সংস্থাকে দেওয়া হয়নি। সদস্যদেশগুলোকে তাদের নিজস্ব নীতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার সংস্থার হাতে থাকলেও সেই নির্দেশকে কার্যে পরিণত করার পুরো দায়িত্বই সদস্যদেশগুলোর ওপর রাখা হয়েছে।

সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য হলো বিশ্বের সব দেশের আর্থিক উন্নয়ন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ লক্ষ্যও সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অন্যান্য আন্ড়র্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ব্যাংকিং সম্পর্ক গড়ে তুলবে। অথচ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মূলত: অসমতা ও বৈষম্য বিকাশ ঘটাচেছ।। নিচের তথ্যগুলো বিবেচনায় নিলে বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের অসমতা ও বৈষম্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।:

- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠনের সময় বিশ্ববাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশের অংশীদারিত্ব ছিল ১.৪ শতাংশ কিন্ড়ু গত দশ বছরের বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.৪৮ শতাংশে।
- বিশ্ব জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ বসবাস করে দরিদ্র দেশগুলোতে, অথচ বিশ্ববাণিজ্যে এই সকল দেশের অংশীদারিত্ব মাত্র ৩ শতাংশ।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গঠন ও পরবর্তী অসম বাণিজ্যের প্রভাব বিশেণ্ডষন করতে গিয়ে দুটি দিক প্রকটিত হয়। প্রথমত: বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গঠন প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতামতের কোন তোয়াক্কাই করা হয়নি। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্বে বা বাণিজ্য আলোচনা সূচীতে আদিবাসী মানুষ ও তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত: গঠন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকলেও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সূচীত বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের প্রভাব বলয়ের বাইরে অবস্থান করছে না। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় এই প্রভাবের দিকসমূহ তুলে ধরার সংক্ষিপ্ত প্রয়াস থাকছে।

ট্রিপস- বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব সংরক্ষন চুক্তি

বানিজ্য সংক্রান্ত মেধা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুফল ও যুগযুগ ধরে মানব সভ্যতার মধ্য দিয়ে অর্জিত লোকায়ত মানবিক জ্ঞানসমূহকে বাণিজ্যিক স্বার্থের অধীনস্থ করে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে মুনাফা অর্জনের হীন মানষিকতার এক উজ্জ্বল নিদের্শন এই চুক্তি। প্রধানত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজবাণিজ্য ও ঔষধ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থের অনুকুলে এই খসড়া প্রণয়ন করা হয়। কর্পোরেট স্বার্থের কুপমন্ডুকতায় নিমগ্ন এই খসড়ায় জনগনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার লোকায়িত জ্ঞানের উপর সামাজিক মালিকানা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সারা বিশ্বের মানুষের সাধারণ অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বিশ্বব্যাপি ধনীদেশের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো অবাধ লুটপাটের অধিকারকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নানা ক্ষেত্রে এই চুক্তির মারাত্মক কু-প্রভাবের সুস্পষ্ট আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন সুধীজন ও রাজনৈতিক মহল। বাংলাদেশে এই চুক্তির নেতিবাচক কিছু প্রভাবের ক্ষেত্র হলো-

(ক) **ট্রিপস ও কৃষি**: বাংলাদেশের কৃষিতে তথা আদিবাসী কৃষকের জীবনে এই চুক্তির মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দুইটি প্রধান দিক থেকে।

- প্রথমত: এই চুক্তি কার্যকর হলে উন্নত দেশের কৃষি বাণিজ্য কর্পোরেশনগুলো আমাদের দেশের কৃষিতে হাইব্রিড ও জীন বিকৃত তথাকথিত ; উন্নত জাতের ফসল ও সব্জি চাষের প্রসার ঘটানোর জন্য আগ্রাসী বাণিজ্যিক ও অন্যান্য পন্থা গ্রহণ করবে। আমাদের কৃষিতে হাইব্রিড ও জীন বিকৃত শস্য ও সব্জির বিস্তার কৃষি থেকে কৃষকদের চিরায়ত মালিকানা

উচ্ছেদ করবে এবং বীজ এবং অন্যান্য উপকরণের জন্য কৃষকদেরকে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যিক কর্পোরেশনগুলোর প্রতি নির্ভরশীল করে তুলবে। এর ফলে মাঠ থেকে সংগ্রহ করা বীজ পুণ:ব্যবহারের ক্ষমতা হারিয়ে কৃষক নির্ভরশীল হয়ে পড়বে কৃষি কর্পোরেশনগুলোর ওপর। মাঠ থেকে হারিয়ে যাবে হাজার বছরের যত্নে লালিত লক্ষ প্রজাতির শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ। এটি আদিবাসী এবং অপরাপর সকল অধিবাসীর জন্য সমানভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এই বাণিজ্যিক কৃষি নারীকে তার প্রথাগত বীজ সংগ্রহের বিশেষ ভূমিকা থেকে বিচ্যুত করবে। আদিবাসী সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে যে কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় তা বাজার অর্থনীতিতে লাভজনক বিবেচিত না হওয়ায় আশঙ্কা করা যায় কৃষি কর্পোরেশনের একচেটিয়া খবরদারিতে হবে বিলুপ্ত। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ৯০'র দশকে ,মাত্র পাঁচটি বহুজাতিক কৃষি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রন করতো বিশ্ব কৃষি বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ। এই আধিপত্য বর্তমানেও অব্যাহত আছে। বহুজাতিক কোম্পানীরা জীন প্রযুক্তিকে খাদ্য সংকট দূরের উপায় হিসেবে প্রচার করে। এই প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উদাহরণস্বরূপ আর্জেন্টিনা ২০০৩ সালে বিশ্বের জীন প্রযুক্তির আওতায় আবাদকৃত ভূমির ২১ শতাংশের মালিক হলেও সেখানে খাদ্য সংকটের চুল পরিমান উন্নতি ঘটেনি। অপরদিকে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জীন প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট খাদ্য উপকরণ আমদানি নিষিদ্ধ রেখেছে। অর্থাৎ আজকে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি 'নিরাপদ খাদ্যের' নিশ্চয়তার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। ২০০৪ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুর মিলিয়ে আমাদের কৃষিমন্ত্রণালয় ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা (কৃষি ক্ষেত্রে প্রাণ প্রকৌশল সহায়তা প্রকল্প-২ এর আওতায়) জীন প্রযুক্তির বিকাশের পক্ষে মত দিলেও-আজ আমাদের অপরিনামদর্শী এহেন প্রাণঘাতি উদ্যোগের বিপক্ষে সরব হতে হবে।

- দ্বিতীয়ত: গবেষণা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার ছদ্মাবরণে উন্নত দেশের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো আদিবাসী মানুষের তথা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক জৈব সম্পদ ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। জনগণের চিরায়ত কৃষিজ জ্ঞানকে প্যাটেন্টের মাধ্যমে দখল করে নিতে চাইবে। বিশ্বজুড়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই প্রাণ সম্পদ ডাকাতির শিকার হচ্ছে। তবে এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে আদিবাসী মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। এ প্রসঙ্গে ব্রাজিলের ক্রাহো ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৯৯ সালে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র একটি অংশের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ক্রাহো ইন্ডিয়ানদের প্রাকৃতিক জৈব সম্পদের অবাধ স্থানান্তরনের চেষ্টা চালানো হয়। যে মুহূর্তে ক্রাহো ইন্ডিয়ান গোষ্ঠী প্রাণসম্পদ ডাকাতির এই প্রচেষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত হয়ে ওঠে তৎক্ষনাৎ তারা সংঘবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে এর মাঝেই প্রায় ৪০০ নমুনা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়ার পাশাপাশি ক্রাহোরা ৫৬ কোটি টাকার মামলা দায়ের করেছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে প্রাণ সম্পদ ডাকাতির প্রক্রিয়াটি ঘটে চলেছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সরলতা ও অনভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সুকৌশল গোপনীয়তায়। এর পাশাপাশি এটাও লক্ষ্যনীয় যে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এই অপরাধকে প্রতিহত করতেও সক্ষম। আমাদের দেশেও আদিবাসী তথা আপামর জনগণের সামনে একই সমস্যা ও সম্ভাবনা বিরাজ করছে।

(খ) **ট্রিপস ও জনস্বাস্থ্য:** এই চুক্তি উন্নত দেশের ঔষধপত্র উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোকে তাদের আবিস্কৃত নতুন ঔষধপত্রের মালিকানা দীর্ঘকাল একচ্ছত্র অধিকারে সংরক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছে। ঔষধপত্রের উপর পূর্বেকার প্যাটেন্ট সময়সীমা ১৫ বছরের পরিবর্তে এই চুক্তি কোম্পানীগুলোকে পঞ্চাশ বছরের নিরঙ্কুশ প্যাটেন্ট অধিকার প্রদান করেছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এই মনোভাবের মধ্য দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা পাওয়ার মানবিক অধিকারকে অস্বীকার করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর একচেটিয়া মুনাফার অধিকারকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। প্যাটেন্ট সংক্রান্ত মতবিরোধ ও যুক্তরাষ্ট্রের একগুয়েমির কারণে শুধুমাত্র ২০০০সালে দক্ষিণ আফ্রিকার দেড় কোটিরও বেশি এইডস রোগী বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়।

জনস্বাস্থের ঝুঁকি বিবেচনা করতে গেলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর দ্বিমুখী চাপের কথা বিবেচনায় আনতে হয়। প্রথমত: বর্তমানেই তারা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। ট্রিপস্ এর বাণিজ্যিক আগ্রাসন চিকিৎসা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে পিছিয়ে দিবে আরো বহুধাপ। দ্বিতীয়ত: আদিবাসী চিকিৎসা জ্ঞান ও ভেষজ উপকরণের লাগামহীন প্যাটেন্টিং আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে করে তুলছে বহুজাতিক কর্পোরেশনের ওপর নির্ভরশীল। তারা হারাচ্ছে তাদের চিকিৎসা উপকরণ আর বহুজাতিক কর্পোরেশন আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা এই জ্ঞান ও উপকরণের প্রকৃত মালিক তাদেরকেই করে তুলছে বাজারজাতকৃত ঔষধের ক্রেতা। এটা নি:সন্দেহে অন্যায্য ও অগ্রহণযোগ্য। এই অসাধু বাণিজ্যিক আগ্রাসন কেবলমাত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীকেই নয় বিশ্বমানবতাকে মুষ্টিমেয় ঔষধ ব্যবসায়ীর হাতে জিম্মি করে তুলছে। এটা অবশ্য বিস্ময়ের নয় স্মরন রাখতে হবে যে, ট্রিপস্ চুক্তির পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর উদ্যোগই ছিল প্রধান।

(গ) **ট্রিপস্ ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানসম্পদ:** আরেকটি বিপদজ্জনক দিক হলো স্বল্পোন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশগুলোর জ্ঞানসম্পদ চুরি বা ডাকাতি। নিমের মতো একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের প্যাটেন্ট করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ডাবণ্ডু আর গ্রেস কোম্পানী। তাদের দাবী নিমের ঔষধি গুণ নাকি তারাই আবিস্কার করেছেন অথচ শত শত বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ নিমকে ব্যবহার করছে নানা প্রকার রোগব্যাধি নিরাময় ও শস্যের কীটপতঙ্গ দমনে। এই বিষয়টি নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

সতর্ক থাকতে হবে যে, বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের প্রবক্তারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীকেও উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে যে, তারা যেন মেধাস্বত্ত্বের ও প্রাণ সম্পদের ওপর কর্পোরেট মালিকানা আরোপের বিষয়টি মেনে নেয়। তবে বিশ্বব্যাপি আদিবাসী জনগোষ্ঠী একই স্বরে এর বিরোধিতা করে চলেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ ট্রিপস্ এর ২৭.৩ (খ) অনুচ্ছেদটির বিরোধিতা করে চলেছে। এই অনুচ্ছেদটি জীবন, জৈব প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তিত অনুজীবের ওপর কর্পোরেট মালিকানা আরোপের বৈধতা দান করেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী তথা মুক্তিকামী মানবতার কাছে এহেন মালিকানা নীতি বহির্ভূত ও অগ্রহণযোগ্য। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মেধাস্বত্ত্ব বিষয়ক সংস্থা (ডওচঙ) আদিবাসী নেতৃত্বকে সেই ১৯৯৯ সালেই পরামর্শ দিয়েছিল যে তারা যেন আদিবাসী প্রাণ বৈচিত্র্য এবং জ্ঞান সংরক্ষণে ট্রিপস্ এর বিরোধীতা না করে ট্রিপস্ মেনে নিয়ে প্যাটেন্ট করার দিকে মনোযোগ দেয়। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর প্রাণসম্পদের ওপর আগ্রাসনকে বৈধতা প্রদান ও এক অসম প্রতিযোগিতার দিকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা চালায়। তবে আনন্দের বিষয় হলো আদিবাসী নেতৃত্ব ১৯৯৯ এর ৩ অক্টোবর প্রত্যাখ্যান করে সেই প্রস্তাব। আজ পর্যন্ত ২৭.৩ (খ) অনুচ্ছেদটি বাতিল করবার পক্ষেই বিশ্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান। জাতীয় আদিবাসী পরিষদও তাদের বিশ্বায়ন বিষয়ক ঘোষণাপত্রে অভিন্ন অবস্থান পোষণ করেছে।

গ্যাটস্: সেবাখাত উদারীকরণ: সেবাখাতের বাজারিকরণ বনাম নাগরিক অধিকার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমে পণ্য বিনিময় ছাড়াও বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানা রকম সেবা যেমন- ব্যাংক, বীমা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, গ্যাস ও পানি পরিসঞ্চালন, ডাক ও তার, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, নির্মাণ শিল্প, পরিবেশ, আর্থিক খাত, বিমান ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল সেবা ও কর্মসংস্থানের বাজারকে ঘিরেও বিবিধ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, সেবাখাতের এই বাণিজ্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে করেছে "সেবা বাণিজ্যের সাধারণ চুক্তি" (এবহবৎধষ অমৎববসবহঃ ড়হ ঞৎধফব রহ ঝবৎারপবং)।

এই চুক্তির মাধ্যমে অনুন্নত দেশের সেবাখাতে উন্নত বিশ্বের বিনিয়োগের সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। ফলে পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গরীব মানুষের মৌলিক ও সার্বজনীন অধিকারগুলো পরিণত হচ্ছে কেনাবেচার পণ্যে।

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশে নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যাংক-বীমা, পানি, সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিবহন খাত, যোগাযোগ খাত (টেলিকমিউনিকেশন ও তথ্য প্রযুক্তি) যদি বাণিজ্যিকভাবে উদারীকরণ করা হয় তবে এ সকল চিরায়ত অধিকার ও নাগরিক পরিষেবা থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হবে। যা দীর্ঘমেয়াদে পুরো জাতিকে পঙ্গু করে দিতে পারে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় অদক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমের রফতানির মাধ্যমে সেবা রফতানি হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের জন্যে সম্ভাবনাময় খাত। শুধুমাত্র অস্থায়ী ভিসা কর্মসূচির ভিত্তিতে উন্নত বিশ্বে শ্রম অভিবাসনের বাজার উন্মুক্ত হলে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি ১৫-২০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বা ১লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বাৎসরিক রেমিট্যান্স আয় করতে পারে। যদিও সেবা চুক্তির মুখবন্ধে শ্রম অভিবাসনের বিষয়ে বড় বড় কথা লেখা আছে কিন্তু নেই একটিও সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার। অথচ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাংলাদেশের সেবাখাত উন্মুক্ত করতে ব্যাংক, বীমা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট শর্ত বেধে দিয়েছে। এই বাজার নির্ভর সংস্কার সাধনের বাধ্যবাধকতাই নাগরিক অধিকারকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে।

নাগরিক পরিষেবাগুলো এ যাবৎকাল বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। নাগরিক অধিকারসমূহকে গ্যাটস্ এর আওতায় যদি বিকিকিনির পণ্যে রূপান্তর করা হয় তবে এই অধিকারসমূহ চিরতরেই বাজার অর্থনীতির দৌড়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরেই থাকবে। বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী তথা বিশ্ব মানবতার সাথে এককাতারে বাংলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকেও প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা, জল, বনসম্পদ প্রভৃতির ওপর নাগরিক তথা জনতার অধিকারকে সরকারিভাবে নিশ্চিত করার সংগ্রামে সক্রিয় হতে হবে। কোনভাবেই যেন এ অধিকার ও নাগরিক পরিষেবা বাণিজ্যিক অবয়বে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে না যায় সে ব্যাপারে সরকারকেই ভূমিকা রাখতে হবে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় স্বল্পোন্নত দেশের সদস্য হিসেবে আমরা 'বিশেষ এবং অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা'র আওতায় বর্ধিত সময় ও সামর্থ্য গড়তে সহায়তা চাইতেই পারি। বাণিজ্য উদারীকরণের এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় কোনভাবেই যেন সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সকল মহলকেই সতর্ক থাকতে হবে। এটাই এখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দাবি এবং এই লক্ষ্যে বিশ্ব জনগণও আজ হয়ে উঠছে ঐক্যবদ্ধ।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তিঃ বাণিজ্যিক হুমকীর মুখে আদিবাসী কৃষি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ঘোষিত কৃষি চুক্তির দুইটি প্রধান লক্ষ্য কৃষি রফ্তানির ক্ষেত্রে অশুল্কজাত বাধা দূর করা ও ক্রমাগত কৃষি ভর্তুকি প্রত্যাহার। এ কারণেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কৃষি চুক্তি বিষয়ক আলোচনায় সবসময় যে বিষয়গুলো ঘুরে ফিরে সামনে আসে তা হলোঃ

ক) ভর্তুকি প্রত্যাহার বনাম নীল, হলুদ ও সবুজ বাক্সের রহস্য
খ) বাজার প্রবেশাধিকার বনাম অ–শুল্কজাত বাধার ভেল্কিবাজি

আভ্যন্ড়রীন কৃষি সহায়তা (ভর্তুকী)

গ্যাট ১৯৪৭ এর অধীনে কৃষিতে সহায়তা বিষয়ক যে পদ্ধতি সমূহ ছিল, উরুগুয়ে রাউন্ড কৃষি বিষয়ক আলোচনা তা মৌলিক ভাবে পরিবর্তন করে দেয়। এই আলোচনার ঘোষিত প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষিতে আভ্যন্ড়রীণ সহায়তা হ্রাস করে তাকে প্রণালীবদ্ধ করা এবং একই সঙ্গে কৃষির জন্য একটি আভ্যন্ড়রীন নীতি গ্রহন করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। আরো ঐক্যমত্যে আসা হয়েছে যে, আভ্যন্ড়রীন সহায়তা দিয়ে বাজার প্রবেশ ও রফতানি প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্থ করা হবে না।

আভ্যন্ড়রীন সহায়তা (ভর্তুকী) প্রদানের দুটো রূপকে বিবেচনায় আনা হয়। একটি হলো এমন সহায়তা যা বাণিজ্যকে যৎসামান্য ক্ষতিগ্রস্থ করে যা (গ্রীনবক্স পদক্ষেপ নামে পরিচিত) অন্যটি হলো, এমন সহায়তা যা বাণিজ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে (এমবারবক্স পদক্ষেপ সমূহ)। উদাহরণ স্বরূপ কৃষি গবেষণা বা প্রশিক্ষণ কাজে সহায়তা করা হলো গ্রীন বক্স পদক্ষেপ অন্যদিকে সরকারের কৃষিপণ্য ক্রয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য বেধে দেয়া (যেমন বাজার মূল্য সহায়তা)হলো এমবারবক্স সহায়তা (ভর্তুকী)। কৃষিচুক্তি অনুসারে কৃষি উৎপাদককে প্রদত্ত সহায়তা (ভর্তুকী) কমানোর জন্যও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের একটি সময় সূচী নির্ধারণ করা আছে।

কৃষি চুক্তি আমাদের মতো দেশগুলোকে নির্দেশ দেয় সকল প্রকার ভর্তুকি হ্রাসের। আমরা যখন কৃষকের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত ও কৃষি উপকরণে ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের জীবিকা নিশ্চয়তা বিধানের চেষ্টা করি তখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চিৎকার করে বলে ‘এটা অন্যায়’। তাদের ভাষায় এটা বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির সুস্পষ্ট লংঘন। আমাদের ভর্তুকি নাকি বিশ্বব্যাপী কৃষির বাজারে খারাপ প্রভাব ফেলছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এই ধরণের ভর্তুকির নাম দিয়েছে ‘এ্যাম্বার বক্স’ যা অবশ্যই পরিতাজ্য।

অন্যদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ যখন তাদের দেশের কৃষকদের কোনোকিছু উৎপাদন না করার জন্য বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেয় তখন তা হয়ে যায় ‘নীল বাক্স ব্যবস্থা’। অথবা তারা যখনই বিনে পয়সায় শস্য কৃষকদের শস্য খামারে পোকা মেরে দেয় অথবা জলসেচ দিয়ে দেয় তখন তা হয় ‘সবুজ বাক্স ব্যবস্থা’। এছাড়াও কৃষি পণ্যের ব্যবসা যারা করছেন তাদেরকেও নগদ ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে তবে কূটকৌশলে তার নামকরণ করা হচ্ছে ‘হলুদ বাক্স ব্যবস্থা’। নীল আর হলুদ বাক্সের ভর্তুকির কমিয়ে আনার কথা থাকলেও সবুজ বাক্সের ভর্তুকি হ্রাসের কোনো চাপ নেই। এই সুযোগে বৃহৎ অর্থনীতিসমূহ এক বাক্সের ভর্তুকি অন্য বাক্সে ঢুকিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে ভর্তুকি হ্রাসের দায়িত্ব।

এর পাশাপাশি লক্ষ্য করার বিষয়, বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ভর্তুকি সমূহ রাখা হয়েছে এম্বার বক্সে। অন্যদিকে ব্যয়বহুল ও উন্নত বিশ্বের কৃষি ও কৃষকের উপযোগি ভর্তুকিকে রাখা হয়েছে নীল বা সবুজ বাক্সে। এর ফলে কৃষি থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারের প্রাথমিক চাপ এসে পড়েছে স্বল্পোন্নত দেশের উপরে। এ কারণেই–

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তি রূপায়নের সময় ১৯৯৭ সালে যেখানে উন্নত দেশ প্রদত্ত কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৩১ শতাংশ। কৃষি চুক্তি বাস্তবায়নের ছয় বছর পরে উন্নত দেশ কর্তৃক ২০০১ সালে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশ।
- যুক্তরাষ্ট্রের “আরকানসাস রাজ্যের” একজন তুলা উৎপাদক এক বছরে ৬ মিলিয়ন ডলার ভর্তুকি গ্রহণ করেছেন, যা ছিল আফ্রিকার তুলা উৎপাদনকারী দেশ মালির ২৫ হাজার তুলা চাষীর সারা বছরের আয়ের সমান। যুক্তরাষ্ট্রের তুলা উৎপাদনে ব্যপক ভর্তুকি আফ্রিকার দারিদ্র্য পীড়িত প্রায় ৩০কোটি দরিদ্র কৃষকের জীবিকা কেড়ে নিয়েছে।
- ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫,০০০ তুলা উৎপাদনকারী ৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছেন ভর্তুকি হিসেবে। অথচ এ বছরই তাদের মোট উৎপাদিত তুলার বিশ্ববাজার মূল্য ছিল ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নও এ চুক্তির আওতায় নীল বাক্স এবং সবুজ বাক্সের চাতুর্যের মাধ্যমে কৃষি খাতের মোট ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি করেছে প্রায় ৩৬ শতাংশ।

বাজার প্রবেশাধিকার (অ–শুল্কজাত বাধা)

কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রত্যাহারের পাশাপাশি কৃষি চুক্তিতে উলেণ্টখিত অ-শুল্কজাত বাঁধা দূর করার ক্ষেত্রেও বৃহৎ অর্থনীতিসমূহ তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চলেছে। তারা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন কিছু পূর্বশর্ত প্রবর্তন করেছে যার ফলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে কৃষি পণ্য রফ্তানি করাই দুরূহ। এর মধ্যে অন্যতম হলো স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী নীতি। সহজ বাংলায় একে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা বলা হলেও এর উদ্দেশ্য জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা নয় বরং নিজ দেশের কৃষি বাজার সংরক্ষণ। স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে কোনো আমদানিকারক দেশ রফ্তানিকারক দেশের কাছে কৃষিপণ্য রফ্তানির পূর্বেই নির্দিষ্ট কিছু স্বাস্থ্য মানের নিশ্চয়তা দাবী করতে পারে।

স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী মান নিশ্চিত করে রফ্তানি করতে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা, যা আমাদের দেশে নেই। আর তা প্রতিষ্ঠা করা ব্যয়বহুল (বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে অন্ততপক্ষে ১৫০মিলিয়ন ডলার)।

অন্যদিকে কৃষি প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত বিশ্বের মান অনুযায়ী কৃষি পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। ফলে উন্নত দেশের বাজারে আমাদের কৃষিপণ্যের রফ্তানি প্রায় দুঃসাধ্য। আফ্রিকার বাদাম কৃষকরা বলে থাকেন- যে বছর আফ্রিকার বাদাম উৎপাদন যত বেশি হয় -সে বছর ইউরোপের বাজারে স্যানিটারী মানদন্ড তত কড়া হয়। এই কূটকৌশল সম্ভব কারণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি মতে, এই মানদন্ডসমূহ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। অর্থাৎ আমদানিকারী দেশ তার দেশের জন, জীব ও প্রাকৃতিক নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে একতরফাভাবে এই মানসূচক নির্ধারণ করতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে আফ্রিকার বাদাম রফ্তানির কথা বলা যায়। আফ্রিকার দেশগুলোর উৎপাদিত বাদাম থেকে যদি এক মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ১.৪ জনেরও মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে তবে সেই বাদামকে স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা দেন। ফলে সে বছর ইউরোপে আফ্রিকার বাদাম রফ্তানি ৬৪ শতাংশ হ্রাস পায়। এতে আফ্রিকার ক্ষুদে কৃষকের ৬৪০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।
কাজেই কৃষি চুক্তি বিষয়ক আলোচনায় আমাদের অবস্থান হতে হবে-

ক) আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশে ক্ষুদে কৃষক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আদিবাসী কৃষি বাঁচাতে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে সকল বাঁধা দূর করা।
খ) উন্নত দেশের বাজার থেকে কৃষি রফ্তানির উপর আরোপিত সকল প্রকার শুল্ক ও অ-শুল্কজাত বাঁধা দূর করা ও সবুজ-নীল-হলুদ যে বাক্সেই থাকুক উন্নত বিশ্বের কৃষি ভর্তুকি অপসারণ আশু প্রয়োজন। যদিও আদিবাসী কৃষি উৎপাদ বাজার নির্ভর নয়, ভর্তুকিপ্রাপ্ত বিদেশী কৃষি আমদানী আদিবাসী কৃষি ও কৃষককেও অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।
গ) প্রকৃতি বিধবংসী জীন বিকৃত কৃষির অশুভ সম্প্রসারণের বিপরীতে প্রকৃতিবান্ধব ও মানসম্মত কৃষি (যার মাঝে আদিবাসী কৃষি অগ্রগণ্য) বিকাশে সহায়ক কার্যকর নীতি, সম্পদ ও মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে, জাতীয় আদিবাসী পরিষদও তাদের বিশ্বায়ন বিষয়ক ঘোষণাপত্রে উলেণ্টখ করেছে যে,

(ক) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কৃষিভিত্তিক জীবনের ঘোর বিরোধী, এই চুক্তির সংকীর্ণ কাঠামো সরকারকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বকীয় কৃষি, নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাণ বৈচিত্র্য ও কৃষিজ্ঞানকে সংরক্ষণ ও বিকশিত করতে আইনী ও আর্থিক সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদানে বাধা দান করে।

(খ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি এবং জাতী নিরপেক্ষ সমান-সুযোগে মূল নীতির আওতার বাইরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বকীয় সাংস্কৃতি ও জীবন ধারাকে সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) বাজার সংরক্ষনের সকল বাধা তুলে নিয়ে আদিবাসী কৃষি ও কৃষিজাতীয় পণ্যের অবাধ বাজার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৪. স্বপ্ন ও সংগ্রামের সম্মিলন

মেক্সিকোর চিয়াপাস আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয় টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম আজ বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। এই সংগ্রাম একই সাথে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও মানবিক বিশ্বায়নের সংহতি সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী

জাপাতিস্তা মুক্তি বাহিনী *(উতখঘ)* মেক্সিকান সরকারের বিরদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের দাবিনামার মধ্যে ছিল "কাজ, জমি, আবাসন, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাধীনতা, মুক্তি, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও শান্তি" *(ঋরৎংঃ উবপষধৎধঃরড়হ ড়ভ ঃযব খধহপধহফড়হ ওঁহমষব)*। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আজও অব্যাহত রয়েছে। এই সংগ্রামের বেশিষ্ট্য হলো যে, দুর্গম পাহাড়ী জনপদ থেকে তথ্য প্রযুক্তির ও জনগণের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা সংহতি নেটওয়ার্কের কল্যাণে এই সংগ্রাম আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেক্সিকোকে দায়বদ্ধ রেখেছে। এই সংগ্রামের প্রতি আদিবাসী তথা মুক্তিকামী বিশ্বজনতার অকুণ্ঠ সমর্থন–আমাদের আলোচনার শুর"তে উলেণ্টখ করা "মানবিক বিশ্বায়ন" প্রক্রিয়ার শক্তি ও সম্ভাবনাকে মুর্ত করে তোলে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনসমূহে আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সংগঠকেরা বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের বির"দ্ধে সরব। এর পাশাপাশি বিশ্ব সামাজিক ফোরাম (ডব্লঝ) আদিবাসী মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ২০০৩ সালের ৯ আগষ্ট বিশ্বায়ন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বিষয়ক আদিবাসী ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। আদিবাসী মুক্তির স্বপ্ন ও সংগ্রামের সাথে আজকে বাংলাদেশের শোষণমুক্ত মানবিক সমাজ গঠনের চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মের"বন্ধন ঘটেছে। আমাদের আজকের এই সমাবেশ ও উৎসব বাংলা নববর্ষের সার্বজনীন অবয়বে ধারণ করছে এই জনপদের সংগ্রামী মানুষের নবতর এক পথচলা। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির এই পথ জাতীয় পরিসীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক দিগন্ত ছুঁয়েছে। আমাদের শত্র"দের মতো আমাদের বন্ধুরাও আছে বিশ্বজুড়ে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই মুক্তির স্বপ্ন ও সংগ্রাম আজ বৈশ্বিক। বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের বিপরীতে মুক্তিকামী মানুষেরা নির্মান করেছে মানবিক বিশ্বায়নের মিছিল। আসুন আমরা এই স্বপ্ন ও সংগ্রামের সম্মিলনে দাবি তুলি "বিশ্বায়ন পুঁজির দাসত্ব ভেঙ্গে কাজ কর"ক প্রগতির পথে"।

*** গ্রন্থসূত্র**

- *Chilón, Avenida;* **Brief History of The Conflict in Chiapas: 1994-2006,** SIAPAS, 2006
- *Ali, A.K.M. Masud; Ali, A.K.M. Mustaque; Sarkar, Ratan;* **Agrarian Living Beyond the Corporate Cage: Peasants Paper on Trade and Globalization,** INCIDIN Bangladesh, 2005
- *Stephen A. Hansen and Justin W. VanFleet,* Traditional Knowledge and Intellectual Property, AAAS, 2003
- *ইনসিডিন বাংলাদেশ*,**আমাদের কৃষি আমাদের প্রাণ,** ইনসিডিন বাংলাদেশ, ২০০৫
- *ইনসিডিন বাংলাদেশ*,**গণপ্রতিরোধের বিশ্বসপ্তাহ,** ইনসিডিন বাংলাদেশ, ২০০৫
- *ইনসিডিন বাংলাদেশ*,**অকৃষিজাত পণ্যের বাজার প্রবেশাধিকার, (NAMA): হংকংয়ে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ষষ্ঠ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে আলোচনার অমীমাংসিত বিষয়**, ইনসিডিন বাংলাদেশ, ২০০৫
- *Jatio Adivashi Parishad:* **Declaration of Indegenous People of Bangladesh on Globalizaton and WTO**, Jatio Adivashi Parishad, 2003
- *Wehlin, Jason*; **Chiapas and the Zapatista rebellion,** The University Sentinel, 1995
- *ইনসিডিন বাংলাদেশ*, **গ্যাট, উর"গুয়ে রাউন্ড ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা,** ইনসিডিন বাংলাদেশ, ১৯৯৮

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

ধারা-১

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সামন মর্যাদা ওঅধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

ধারা-২

এ ঘোষণায় উলেণ্ঢখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত , জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে।

কোনো দেশ বা ভূ-খন্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোনো অধিবাসীর প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য করা হবে না; সে দেশ বা ভূখন্ড স্বাধীনই হোক, হোক অছিভূক্ত, অস্বায়ত্তশাষিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোনো সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

ধারা-১৫

১. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।
২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না ।

ধারা-২০

১. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।
২. কাউকে কোনো সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকেরই আপন মর্যাদা এবং ব্যাক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৩

২.কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা-২৭

১. প্রত্যেকেরই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফল সমূহে অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।
২. বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা ভিত্তিক কোনো কর্মের রচয়িতা হিসেবে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষনের অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে।

ধারা-২৯

১. প্রত্যেকেরই সে সমাজের প্রতি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে, যে সমাজেই কেবল তাঁর আপন ব্যাক্তিত্বের স্বাধীন এবং পূর্ণবিকাশ সম্ভব।
২. আপন স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহ ভোগ করার সময় প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ঐ ধরণের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না যা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণে ন্যায়ানুগ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আইন দ্বারা নির্নীত হবে

ধারা-৩০

কোনো রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যাক্তি এই ঘোষণাপত্রের কোনো কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার বলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উলেণ্ঢখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাৎ করতে পারে এমন কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের

কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

প্রথম ভাগপ্রজাতন্ত্র

ধারা-৭ (১)

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগেণর পক্ষে সে ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে

২য় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি: গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

ধারা-১১
প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে

তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী

ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য:

২৮ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুর"ষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুর"ষের সমান অধিকার লাভ করিবেন
(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুর"ষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জণসাধরণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে বা প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।
(৪) নারী বা শিশদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

সরকারী নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা

২৯ (১) প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে
(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুর"ষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই
(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকুলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে,
(খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষনের বিধান সম্বলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,
(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাঁহা নারী বা পুর"ষের পক্ষে অনুপোযোগি বিবেচিত হয় সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুর"ষ বা নারীর জন্য সংরক্ষন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না

সম্পত্তির অধিকার

৪২ (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেখ নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যাবস্থা পরিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যাতিত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।
(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামলূকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত করণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে, তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণ বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সে আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) ১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের ১ নং ফরমানসমূহ আদেশ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন

আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যাতিত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত করণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।